যায়যায়দিন

তারিখ SEP. 03 2006
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

আবদুল কাদির

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে অশনি সঙ্কেত

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পুনর্গঠন) আদেশ ১৯৮০ অনুসারে, সরকারি নীতিসমূহ যথাসম্ভব দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত করার এবং সুদৃঢ় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গঠন করার উদ্দেশ্যে সরকার সিভিল সার্ভিসগুলোর পুনর্গঠন করেছে এবং ৩০টি ক্যাডার সার্ভিস তৈরি করেছে। পরে কিছুটা রদবদলের কারণে বর্তমানে ক্যাডারের সংখ্যা ২৯টি। বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) এগুলোর অন্তর্ভুক্ত একটি ক্যাডার।

এই ক্যাডার বর্তমানে গভীর সঙ্কটের সম্মুখীন। ক্যাডার সার্ভিসগুলোতে নিয়োগের জন্য সরকারের একটি নীতিমালা রয়েছে এবং বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই কেবল এ ধরনের চাকরিতে প্রবেশ করতে হয়। কিন্তু শিক্ষা ক্যাডারে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষমতাসীন দল রাজনৈতিক বিবেচনায় বেশ কিছু বেসরকারি কলেজকে সরকারি করার ফলে এ সঙ্কটের সৃষ্টি। সরকারিকরণের কারণে ওই প্রতিষ্ঠানের সব শিক্ষক-কর্মচারীর চাকরিও সরকারি চাকরিতে আত্তীকৃত করা হয়। এক্ষেত্রে পিএসসি নির্ধারিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ দূরের কথা, যাদের চাকরিতে প্রবেশের ন্যূনতম যোগ্যতা নেই তাদের চাকরিও আত্তীকৃত হয়ে যায় শুধু ওই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হওয়ার কারণে। অনেকের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে একাধিক তৃতীয় শ্রেণী রয়েছে। কিন্তু শুধু সিনিয়রিটির কারণে তাদের অনেকেই পদোন্নতি পেয়ে উচ্চতর পদ অলঙ্কৃত করেন। এখানে উল্লেখ্য, আত্তীকরণ বিধিমালা ১৯৮১ অনুসারে আত্তীকরণের সময় একজন শিক্ষকের বেসরকারি চাকরিকালের ৫০ শতাংশ চাকরিকাল ইফেকটিভ সার্ভিস হিসেবে গণনা করা হয়। ওই বিধিমালার চতুর্থ ধারা অনুসারে একজন শিক্ষকের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে যদি তৃতীয় শ্রেণী থাকে তাহলে তিন বছরের মধ্যে মান উন্নয়ন পরীক্ষার মাধ্যমে তা পরিবর্তন করার বিধান করা হয়।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই বিধানটি কখনো কার্যকর করা হয়নি। এখানেই শেষ নয়, পরবর্তী সময়ে আত্তীকৃত শিক্ষকরা তাদের বেসরকারি চাকরিকালের শতকরা ১০০ ভাগ সময় সরকারি চাকরি হিসেবে গণ্য করার দাবি তোলেন এবং গোপনে পরিচালিত মামলা-মোকদ্দমার মাধ্যমে এক ধরনের অচলাবস্থার সৃষ্টি করেন। ফলে সৃষ্টি হয় নতুন জটিলতা। এ কারণে প্রায় ১০ বছর পদোন্নতিবঞ্চিত হন সরকারি কলেজের শিক্ষকরা। ফলে তাদের মনে জন্ম নেয় গভীর হতাশাবোধ।

এর পরিপ্রেক্ষিতে বিবদমান উভয় গ্রুপের শিক্ষক নেতাদের সম্মতিতে এবং সমঝোতার মাধ্যমে প্রণীত হয় আত্তীকরণ বিধিমালা-২০০০। এতে ওই বিধি কার্যকর হওয়ার আগ পর্যন্ত যারা চাকরিরত ছিলেন তাদের বেসরকারি চাকরিকালের পঞ্চাশ শতাংশ সময়কাল ইফেকটিভ সার্ভিস হিসেবে গণনা করা হয়। কিন্তু এ বিধিমালা কার্যকর হওয়ার পর থেকে ওই নিয়ম বাদ দিয়ে চাকরি নিয়মিতকরণের তারিখ থেকে সরকারি চাকরিকাল গণনা করার বিধান করা হয়। এ বিধান করা হয় এ কারণে যে, বেসরকারি চাকরিকাল ইফেকটিভ সার্ভিস হিসেবে গণ্য করার ফলে যখনই কোনো কলেজ সরকারিকরণ করা হয় তখনই যারা বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে চাকরিতে প্রবেশ করেছেন তারা জ্যেষ্ঠতা তালিকায় তাদের পূর্ববর্তী অবস্থান থেকে পিছিয়ে পড়েন।

বার বার এ ঘটনা ঘটতে থাকে এবং প্রতিনিয়ত তারা পেছাতে থাকেন। একটি বেসরকারি কলেজ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, কিভাবে শিক্ষকদের চাকরিতে নিয়োগ দেয়া হয় অনেকেই এ বিষয়টি জানেন। অধিকাংশ বেসরকারি কলেজে নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা, আঞ্চলিকতা, আত্মীয়তা, ডোনেশন ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য পায়। অন্যদিকে বিসিএস পরীক্ষা সব বাংলাদেশি নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত। এ পরীক্ষা সম্পন্ন করতে সময় লাগে তিন বছর। তাছাড়া অনেকেরই আবার বেসরকারি কলেজে চাকরি করার অভিজ্ঞতাও থাকে। কিন্তু এ অভিজ্ঞতা কখনোই সরকারি চাকরিতে যোগ করা হয় না। এটা কি এক ধরনের বৈষম্য নয়?

আত্তীকরণ বিধিমালা-২০০০ জারি হওয়ার পর থেকে বিগত ২০০৫ সালের মে মাস পর্যন্ত পদোন্নতি প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। কিন্তু তারপর থেকে বিশেষত লেকচারার থেকে অ্যাসিস্টান্ট প্রফেসর পদে পদোন্নতি প্রক্রিয়া থেমে গেছে। আত্তীকৃত শিক্ষকরা নতুন করে জটিলতা সৃষ্টি করছেন। তারা আবার ভূতাপেক্ষিক জ্যেষ্ঠতাসহ পদোন্নতি এবং চাকরিতে প্রবেশের পর সবার জন্য বাধ্যতামূলক বিভাগীয় পরীক্ষা ও পদোন্নতির জন্য নির্ধারিত পরীক্ষায় পাসের শর্ত প্রমার্জনের দাবি তুলছেন। বিস্ময়করভাবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তি তাদের এ দাবিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখছেন। এখানে দুর্নীতির একটা গন্ধ পাওয়া যায় বৈকি।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি হচ্ছে শিক্ষা ক্যাডারের সর্ববৃহৎ সংগঠন। মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও শতকরা ৯০ ভাগ শিক্ষকের প্রতিনিধিত্ব করে এ সংগঠন। অন্যদিকে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা অ্যাসোসিয়েশন নামে কোনো সংগঠন কখনো ছিল না। এ সংগঠনটির জন্ম অতি সাম্প্রতিককালে এবং তৈরি হয়েছে একজন বিপথগামী, উচ্চাভিলাষী আমলার ছত্রছায়ায়। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সুবিধাবাদী চরিত্রের একজন অ্যাসিস্টান্ট প্রফেসর ভুইফোঁড় সংগঠনটির জন্ম দিয়েছেন। উক্ত শিক্ষক নিজেকে বর্তমান সরকারপন্থী বলে প্রচার করলেও তিনি ছাত্রজীবনে বর্তমান বিরোধীদলীয় একটি ছাত্র সংগঠনের ক্যাডার ছিলেন। ওই সংগঠনের ব্যানারে বিভিন্ন অযৌক্তিক দাবি দাওয়া দিয়ে পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি করেছেন।

১৬শ বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একজন প্রার্থী চাকরিতে যোগ দেয়ার পরে ১০ বছর চাকরি করেও পদো
পান না, চার বছর পূর্তিতে
সিলেকশন গ্রেড অন্য ক্যাডা
কর্মকর্তারা পেয়ে থাকেন সেই সু
থেকেও বঞ্চিত হয়েছে
চাকরিজীবনের শুরুতে যে বেতন
ছিল এখনো তাই রয়ে গেছে।
অবস্থায় চাকরিতে পরিপূর্ণভ
মনোনিবেশ করা বা আত্মনিয়োগ
তার পক্ষে কতোটুকু সম্ভব? এই
হয় অবস্থা তাহলে নতুন প্রজ
মেধাবীরা শিক্ষকতা নামক ম
পেশায় আসতে চাইবে কে
বেসরকারি কলেজের শিক্ষক
চাকরিজীবনের দুই ও চার ব
পূর্তিতে নতুন বেতন স্কেল পে
থাকেন সবাই। অন্যদিকে আট ব
পূর্তিতে তাদের একটি অংশ পদোন
পেয়ে থাকে। কিন্তু সরকারি কলে
ক্ষেত্রে পদোন্নতির কোনো সময়সী
নেই, অনেক ক্ষেত্রেই প্রথম পদোন্ন
জন্য দশ থেকে পনের বছর
তারচেয়েও বেশি সময় লাগে।

দেশের বৃহত্তর বিশ্ববিদ্যালয়-ক
বলতে এখনো সরক
কলেজগুলোকেই বোঝায়। মেধ
ছাত্রদের একটি বড় অংশ এ
কলেজে অধ্যয়নরত। শিক্ষার গুণ
মানের দিক থেকে বেসরক
কলেজগুলোর চেয়ে অনেক এগি
আছে বড় বড় সরকারি কলেজ। এ
কলেজে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হ
দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নেমে আস
বিপর্যয় যা কারো কাম্য হতে পারে
সদাশয় সরকারের কর্তাব্যক্তি
বিষয়টি যতো তাড়াতাড়ি অনু
করবেন ততোই দেশের
মঙ্গলজনক হবে।

শিক্ষকদের দাবি, শুধু বিসিএস পরী
দিয়ে সবাই চাকরিতে প্রবেশ কর
বিভাগীয় পরীক্ষা এবং পদোন্ন
পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে শুধু তাদে
পদোন্নতি দেয়া হোক। যারা পরীক্ষ
পাস করবে না তাদের পদোন্ন
জন্যও বিধি রয়েছে। ওই বি
অনুসরণ করে তাদের পদোন্নতি
যেতে পারে। বর্তমান সরক
মেধাবীদের পদোন্নতি দেয়াকে এব
নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে
বিভিন্ন সময়। প্রশ্ন হলো, য
বিসিএস পরীক্ষা না দিয়ে পেছ
দরজা দিয়ে সরকারি চাকরিতে প্র
করেন, যারা পদোন্নতির পরীক্ষায় প
করতে পারেন না- তারা কোন শ্রে
মেধাবী?